৩১-৪৭

অসুখ-বিসুখ

৩৮

এই সংখ্যায়—

- পরের ধনে পোদ্দারি
- অপারেশন করে শ্বেতি সারানো
- গর্ভাবস্থায় বমির বিপদ
- গ্লুকোমার বিপদ
- কৃমির ওষুধ
- ম্যানেজড্ কেয়ার কী ও কেন?

(এই পত্রিকায় কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না)

৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

জুলাই - আগস্ট ২০০৬

REISTERED WITH REGISTRAR OF NEWS PAPERS FOR INDIA (RNI) UNDER NO. WBBEN/2001/7872

সূচীপত্র

৩৩ কোন কোম্পানির ওষুধ ভালো, তা ডাক্তার বোঝেন কী করে? (সম্পাদকীয়)

৩৫ পরের ধনে পোদ্দারি !

৩৬ গর্ভাবস্থায় বমি ও ওজন বৃদ্ধি

৪১ শ্বেতির জন্য সার্জারি

৪৬ গ্লকোমা ঃ অন্ধত্বের এক বিশেষ কারণ

৪৮ কৃমি রোগের ওষুধ

৫২ গাঁটে ব্যথার জন্য রক্ত পরীক্ষা ঃ দরকারি-অদরকারি

৫৭ স্বাস্থ্য বীমার পরে কি ম্যানেজ্‌ড কেয়ার?

৬১ খবরাখবর

৬৩ অসুখ-বিসুখ পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

ফাউণ্ডেশান ফর হেলথ অ্যাকশানের কয়েকটি প্রচেষ্টা ঃ

- বোধির (ইংরেজী ভাষায়, মূলত চিকিৎসকদের জন্য) প্রকাশ ঃ

  Bulletin On Drug & Health Information (BODHI), a bimonthly, primarily for medical practitioners

- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা সভা এবং কর্মশালার আয়োজন করা
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে বইপত্র প্রকাশ করা
- ওষুধ ও চিকিৎসা বিষয়ে নিরপেক্ষ এবং প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করা

ফাউন্ডেশান ফর হেলথ্ অ্যাকশনের (একটি মুনাফাবিহীন, জনকল্যাণমুখী ট্রাষ্ট) লক্ষ্য ঃ

- অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এবং ক্ষতিকারক ও ফালতু ওষুধের বিলোপ এবং যুক্তিপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ওষুধের প্রসার।
- বিভিন্ন সংগঠন এবং গোষ্ঠীর সাথে সম্মিলিত ভাবে বঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলনে সামিল হওয়া।
- চিকিৎসা-ক্রেতা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চিকিৎসকদের প্রকৃত তথ্য জানার অধিকারের দাবিকে জোরদার করা।

৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা (জুলাই - আগস্ট ২০০৬) পত্রিকার দাম ঃ দশ টাকা

স্বাস্থ্য বীমার পরে কি ম্যানেজ্‌ড কেয়ার?

ডা. পূণ্যব্রত গুণ

(অসুখ-বিসুখ পত্রিকার ৩৭ নং সংখ্যায় আমরা 'মেডিক্লেম' বা স্বাস্থ্যবীমার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এবারে আমাদের আলোচ্য বিষয় 'ম্যানেজ্‌ড হেল্‌থ কেয়ার'। এই মুহূর্তে হয়তো আমাদের দেশে 'ম্যানেজ্‌ড হেল্‌থ কেয়ার' চালু হবে না, কিন্তু যে ভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানির ও থার্ডপার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরগুলোর প্রভাব বেড়ে চলেছে এবং সরকার যেভাবে স্বাস্থ্যবীমার ধারণাকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে তাতে বোঝা যায় গতিমুখ 'ম্যানেজ্‌ড হেল্‌থ কেয়ার'-এরই দিকে। যতই হোক ম্যানেজ্‌ড হেল্‌থ কেয়ার আমেরিকান মডেল আর যা কিছু আমেরিকান তাই আমাদের শাসক বর্গের কাছে ভালো)।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অন্যান্য দেশের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও চিকিৎসা পরিষেবা ছিলো একটা পণ্য, যার কাছে পয়সা আছে সে চিকিৎসা কিনতে পারে, যার নেই সে বিনা চিকিৎসায় মরে। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে রাষ্ট্র সব নাগরিকদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে থাকে। সরকার নাগরিকের চিকিৎসার দায়িত্ব নিক এই ধরনের সংস্কারের দাবি উঠতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও।

কিন্তু আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন রাষ্ট্র পরিচালিত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে 'কমিউনিস্ট বিপ্লব'-এর সমান মনে করে এই সংস্কারের বিরোধিতা করে। কিছু চিকিৎসক কিন্তু সরকারি সংস্কার থেকে নিজেদের ব্যবসার ক্ষতি আটকাতে দুটো বীমা কোম্পানি খোলেন — 'ব্লু ক্রস' যা হাসপাতালের খরচ দেবে আর 'ব্লু শিল্ড' যা যোগাবে ডাক্তারের খরচ। তার পরের ২০ বছরে বীমা কোম্পানিগুলোর বাড়-বাড়ন্ত হতে থাকে এবং এরা মধ্যবিত্ত মানুষদের চিকিৎসার সিংহভাগ খরচ যোগাতে থাকে। মাঝারি ও বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ দেওয়া শুরু করে, কেন না তাতে ইনকাম ট্যাক্স-এ ছাড় পাওয়া যেতো।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে রাষ্ট্রপতি জনসনের মহান সমাজ কর্মসূচী (Great society programme)-র অঙ্গ হিসাবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চিকিৎসার খরচ যোগাতে 'মেডিকেয়ার'(Medicare) ও গরিবদের চিকিৎসার জন্য 'মেডিকেড' ব্যবস্থা চালু করা হয়। ফলে কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানিয় সরকার মোট চিকিৎসার খরচের শষতকরা ৪৬ ভাগ অবধি যোগাতে থাকে। হাসপাতাল ও ডাক্তারের খরচ যত দিন ধরাছোঁয়ার মধ্যে ছিলো ততদিন বীমা কোম্পানি বা সরকার ওই খরচ চালিয়ে যাচ্ছিলো। ১৯৪৬-এর হিল-পার্টন আইন ও ১৯৭৫ এ তার সংশোধনীতে বলা হয় - যে সব হাসপাতাল কেন্দ্র সরকারের অর্থ নেয় তাদের সবার, বিশেষত গরিবদের চিকিৎসা দিতেই হবে। অর্থাৎ একদা যা ছিল পণ্য তা মানুষের অধিকারের রূপ নেয়।

এর আগে অবধি চিকিৎসার ক্রমবর্ধমান খরচ অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসাকে সীমিত রাখতো। এবার 'মেডিকেয়ার' ও 'মেডিকেডের' লাভ তুলতে শুরু করলেন ডাক্তাররা ও হাসপাতালগুলো। বীমা কোম্পানি গতানুগতিক খরচগুলো বহন করতে আপত্তি করতো না। দ্রুত হারে হাসপাতালে বেড বাড়তে লাগলো। ১৯৭০ থেকে ১৯৯৯ এর মধ্যে চিকিৎসা খাতে খরচ দ্বিগুণ বেড়ে গেলো।

সত্তরের দশকে এক দিকে চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি, অন্য দিকে গরিব শ্রমজীবী ও তাঁদের পরিবারগুলোর

চিকিৎসা বীমা না থাকা — এ দুই সমস্যা নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। বেকার মানুষেরা 'মেডিকেড'-এর সুবিধা পেতেন, কিন্তু ছোটো ব্যবসার কর্মী, আংশিক সময়ের কর্মী, ঠিকা ও অস্থায়ী কর্মীদের নিয়োগকর্তরা তাদের কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবীমা করাতো না। আর কম আয়কারী স্বনিযুক্ত মানুষরা চিকিৎসা বীমার সুযোগ নিতেই পারতেন না।

একদিকে অন্য সব শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট চিকিৎসা খরচ বেশি, হাসপাতালের শয্যাব্যবহার, ওষুধ ব্যবহার, পরীক্ষা-নিরীক্ষার হার বেশি, অন্যদিকে গড় আয়ু, নবজাতকের মৃত্যুর হারের মত স্বাস্থ্যের সূচকগুলোতে ওই দেশ পেছিয়ে। তাই স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থার ধারণা এলো — যারা চিকিৎসার মান উন্নত করবে, হাসপাতাল ও ডাক্তারের অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবহার কমিয়ে খরচ কমাবে এবং বিভিন্ন প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা নেবে। স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থাগুলোকে উৎসাহ দিয়ে আইনে সই করলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন। প্রথমে বলা হয়েছিলো চিকিৎসার মান বাড়ানোর কথা, এবার উদ্দেশ্য হলো খরচ কমানো। ১৯৮০ তে প্রেসিডেন্ট রেগান অধিকাংশ মামলা থেকে স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থাগুলোকে রক্ষা কবচ দিলেন।

বীমা কোম্পানি কেবল চিকিৎসার খরচ দিতো। স্বাস্থ্য রক্ষক সংস্থাগুলো নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে চিকিৎসা দিতে লাগলো। সরকার হাসপাতালে ভর্তি হওয়া, ভর্তি থাকা, অপারেশনের পর ভর্তি থাকা এসব বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করতে থাকলো। কোন রোগীকে ভর্তি করা যাবে তার নিয়ম তৈরি হলো। রোগীকে খুব অসুস্থ হতে হবে — ১০২° ফারেনহাইটের বেশি জ্বর, রক্তচাপ ৮০/৬০ এর কম বা ১৮০/১২০ র বেশি, শ্বাসগতি মিনিটে ৩০-এর বেশি, ইত্যাদি। অথবা রোগীকে ডাক্তার খুব অসুস্থ করার পরিকল্পনা করছেন - বড়ো অপারেশন, আক্রমণাত্মক কেমোথেরাপি ইত্যাদি। তখন হাসপাতালে ভর্তি কারা যাবে। হাসপাতালগুলোকে কমিটি তৈরি করতে হলো, যারা চিকিৎসকরা ল্যাবরেটারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এক্স-রে ইত্যাদি প্রয়োজনের বেশি ব্যবহার করছেন কিনা নজরদারি করবে। কোনো রোগীর হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বা ভর্তি থাকা অপ্রয়োজনীয় মনে করলে তার খরচ যোগানো স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থা অস্বীকার করতে লাগল। অধিকাংশ নিয়োগ কর্তা তাঁদের কর্মীদের স্বাস্থ্যবীমার বদলে কম খরচের স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থার সুযোগ দিতে লাগলো। বিল ক্লিন্টনের রাষ্ট্রপতিত্বের প্রথম দিকে নাগরিকদের চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধির একটা চেষ্টা হয়েছিলো বটে কিন্তু বড়ো শিল্পপতিরা সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে। খরচ কমাতে হবে - খরচ কমানোর হাতিয়ার হলো স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থার চিকিৎসা পরিষেবা প্রবন্ধন বা ম্যানেজ্‌ড কেয়ার।

ম্যানেজ্‌ড কেয়ার কি?

আগের ব্যবস্থায় নিয়োগকর্তা এক বীমা কোম্পানিকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম দিতো কোম্পানির কর্মচারীর ও তাঁর পরিবারের জন্য। বীমাকৃত রোগী যে কোনও ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে যেতে পারতেন, বীমা কোম্পানি শতকরা ৮০ ভাগ খরচ দিতো, বাকিটা দিতে হতো রোগীকে। ম্যানেজ্‌ড কেয়ারে, নিয়োগকর্তা একটা ম্যানেজ্‌ড কেয়ার সংস্থার সঙ্গে বোঝাপড়া করে। সংস্থা ডাক্তারদের ভাড়া করে বা তাঁদের সঙ্গে চুক্তি করে পরিষেবা দেওয়ার জন্য। সংস্থার নিজস্ব হাসপতাল থাকে বা অন্য হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তি থাকে। রোগী কেবল সংস্থার তালিকায় থাকা ডাক্তার বা হাসপাতালের পরিষেবা নিতে পারেন। ম্যানেজ্‌ড কেয়ার সংস্থাগুলোর উদ্দেশ্য হলো চিকিৎসা পরিষেবার চাহিদা কমানো ও খরচ কমানো।

চাহিদা কমাতে এক দ্বাররক্ষী, সাধারণত নার্স, রোগীর

উপসর্গ দেখে ঠিক করেন রোগী জেনেরাল ফিজিশিয়ানের কাছে পৌঁছতে পারবেন কিনা। বীমা কোম্পানির আমলে জেনেরাল ফিজিশিয়ান যে পরিষেবা দিতেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ধরনের পরিষেবা দিতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। জেনেরাল ফিজিশিয়ান রেফার করলেই কেবল বিশেষজ্ঞকে দেখানো যায়। খরচ দিতে অস্বীকার করে ইমার্জেন্সি পরিষেবা ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হয়। হাসপাতালে ভর্তি হতে আগে অনুমোদন লাগে, অনেক ধরনের চিকিৎসায় দ্বিতীয় ডাক্তারের মতামত (second opinion) নিতে হয়। হাঁপানি, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগীর দীর্ঘকালীন খরচ সাপেক্ষ চিকিৎসার ভার থাকে সাধারণত নার্সদের ওপর। ওষুধ ব্যবহার করা যায় কেবল নির্দিষ্ট তালিকা থেকে । পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করে চিকিৎসকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো, সার্জেন বা বিশেষজ্ঞকে রেফার করা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাধারণত উচিত হলো একজন রোগীর কাছে তাঁর রোগের চিকিৎসার বিকল্পগুলো বলে রোগীকে নিজের পছন্দমত চিকিৎসা বেছে নিতে দেওয়া। সংস্থাগুলোর মুখ বন্ধ রাখার নিয়মে ডাক্তাররা বাধ্য হতেন কেবল সংস্থা নির্ধারিত চিকিৎসার কথা বলতে, পরে অবশ্য আইন করে এই অনৈতিক নিয়ম বন্ধ করা হয়েছে। ডাক্তারদের ম্যানেজ্‌ড কেয়ার সংস্থা নির্ধারিত চিকিৎসার নিয়ম মানতে বাধ্য করে তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। এই রকম সব উপায়ে চিকিৎসা পরিষেবার সব দিকগুলোকে ম্যানেজ্‌ করা হয় ম্যানেজ্‌ড কেয়ারে। খরচ কমাতে ম্যানেজ্‌ড কেয়ার সংস্থাগুলো কম বয়সী অপেক্ষাকৃত সুস্থ রোগীদের ধরছে, হাসপাতাল ও ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে কম খরচের বোঝাপড়া করে, ডাক্তারদের বাধ্য করে কম পারিশ্রমিক নিতে।

(ম্যানেজ্‌ড কেয়ারের আবার রকমফের আছে, সে সব নিয়ে আলোচনা আজকের অবস্থায় অনাবশ্যক।)

ম্যানেজ্‌ড কেয়ারের বিপদ ঃ

প্রথমে দেখা যাক রোগীরা কি সমস্যার সম্মুখীন হন। রোগীর সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ডাক্তারেরর দেখা পাওয়া - অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ অপেক্ষা করাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। রোগ জটিল হলে সমস্যা আরও কঠিন - কেন না প্রাথমিক ডাক্তার ম্যানেজ্‌ড কেয়ার সংস্থার অনুমোদন ছাড়া বিশেষজ্ঞের কাছে রোগীকে পাঠাতে পারেন না, সংস্থা সাধারণত অনুমোদন দিতে নারাজ থাকে, কেন না বিশেষজ্ঞকে দেখানো মানে বেশি পয়সা খরচ। প্রাথমিক ডাক্তার তাঁর বিচার বুদ্ধি মত বিশেষজ্ঞের কাছে রোগীকে পাঠাতে পারেন না, তাঁকে পাঠাতে হয় সংস্থা নির্ধারিত বিশেষজ্ঞের কাছে, সেই বিশেষজ্ঞ হয়তো রোগীর বিশেষ সমস্যার সমাধানে সর্বোত্তম নন।

ডাক্তরদের ওপর স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থার প্রভাব আরও ভয়ানক। কারখানার অ্যাসেম্‌লি লাইনে শ্রমিকদের যেরকম মেশিনের মত কাজ করে যেতে হয়, সে রকম ভাবে তাঁরা একেক জন রোগীর পেছনে খরচ করতে পারেন মাত্র ১০ মিনিট, তা রোগ যত জটিলই হোক না কেন। রোগীর পেছনে বেশি সময় দিলে নজরদারের কুনজরে পড়েন ডাক্তাররা। ডাক্তাররা স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থার নির্দেশ মেনে কাজ করছেন কিনা তা দেখেন সংস্থার কেরানী। সংস্থা চালান আমলারা, তাঁদের ধারণা 'রান্নার বই'-এর মতো নিয়ম মেনে চিকিৎসা করা সম্ভব, সেই নিয়ম থেকে কোনো বিচ্যুতি হলে ডাক্তারকে শাস্তি পেতে হয়। কোনো বিশেষ রোগীর চিকিৎসায় ডাক্তার চাইলেও কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারেন না, পরিষেবাটা হয় নিষ্প্রাণ। রোগীর পেছনে ডাক্তার যতটা সময় দেন, তার থেকে অনেক বেশি সময় দিতে হয় কাগজপত্র লেখায়, কি করা হলো, কেন করা হলো— সব কিছুর তথ্য ও প্রমাণ রাখতে হয়। সব কিছুর জন্য ডাক্তারকে অনুমতি নিতে হয় সংস্থার —

তাঁদের জীবনের অর্ধেক সময় চলে যায় ওই সংস্থার অফিস কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে, ব্যাখ্যা করে — কেন রোগীর কোনো বিশেষ চিকিৎসা দরকার, কেন রোগীকে আরও বেশি দিন ভর্তি রাখার দরকার.....। ডাক্তার কেবল সংস্থার তালিকার ওষুধ লিখতে পারেন, যদি রোগীর কোনো বিকল্প ওষুধ লেখা দরকার হয় যার দাম বেশি, - তাও লেখা সম্ভব নয়। কেন না সংস্থা পয়সা দেবে না।

আর্থিক দিক দিয়েও চাপে থাকেন ডাক্তাররা। স্বাস্থ্য রক্ষক সংস্থা ঠিক করে কখন কতটা টাকা দেওয়া হবে। টাকা এত কম ও এত দেরিতে পাওয়া যায় যে ডাক্তারদের পরিকাঠামো বজায় রাখতে অসুবিধা হয় অনেক সময়।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো— ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক খারাপ হওয়া। ডাক্তার হয়ে যান কেবল পরিষেবা প্রদানকারী, তাঁর পেশাগত প্রতিষ্ঠা ও নামযশ জলাঞ্জলি যায়। খরচ কমানোর জন্য ডাক্তার পুরস্কার পান, তাই রোগীর প্রয়োজনীয় অথচ খরচ সাপেক্ষ চিকিৎসা তাঁরা এড়িয়ে চলেন। দেখা যাচ্ছে স্বস্থ্যরক্ষক সংস্থার ব্যবস্থায় রোগীরা ডাক্তারদের ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছেন — তাঁরা মনে করছেন ডাক্তাররাই তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করছেন।

স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থা ঠিক করে ডাক্তার কি করবেন, কি করবেন না। কিন্তু কোনো গন্ডোগোল হলে রোগীর ক্রোধ এসে পড়ে ডাক্তারের ওপর। চিকিৎসার সিদ্ধান্তের জন্য তো স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থার অফিসের কর্মী বা বাবুদের কেউ দায়ী করবে না! এই ব্যবস্থায় নৈতিক ভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ডাক্তারকে উত্তর দিতে হচ্ছে দুই প্রভুর কাছে - এক প্রভু স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থা খরচ কম রাখতে বলছে, অন্য প্রভু অর্থাৎ রোগী চাইছেন উচ্চমানের চিকিৎসা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছেন রোগী ও ডাক্তাররা। রোগীদের অধিকারের জন্য, স্বাস্থ্যরক্ষক সংস্থার অনাচার থেকে রোগীদের রক্ষা করার জন্য আইন পাশ করা হচ্ছে। ডাক্তাররা ইউনিয়নে যোগ দিচ্ছেন, স্বাস্থ্য রক্ষক সংস্থার মডেলের বিকল্প মডেল গড়ছেন তাঁরা, যেমন প্রাইভেট প্র্যাকটিস নেটওয়ার্ক।

ভারতে চিকিৎসা ক্ষেত্র থেকে সরকার হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, নানা ভাবে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য বীমাকে, এবার আসবে ম্যানেজড্ কেয়ার — বীমাকারী ও বীমা কোম্পানির মাঝে থার্ড পার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে তারই অশনি সংকেত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকায় ম্যানেজ্ড কেয়ারের মডেল রপ্তানি করার পর, এবার হয়তো ভারতের পালা।

স্বাস্থ্য বীমা নয়, ম্যানেজ্ড কেয়ার নয়, দাবি করুন চিকিৎসা ব্যবস্থার সামাজিকী করণের, যেখানে ডাক্তার, পুলিশ-মিলিটারীর যত স্বাস্থ্য-চিকিৎসাও হবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, নাগরিকের আর্থিক অবস্থা নয় তাঁর প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমান চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে দেশের সরকার, সমস্ত ডাক্তার ও চিকিৎসাকর্মী সরকারের বেতন-ও পেনশন-ভোগী হবেন, স্বাস্থ্য প্রতিনিধিগুলো গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ এই লেখাটার জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে মুম্বাই থেকে প্রকাশিত *Issues in Medical Ethics*-এর দুটো প্রবন্ধের। প্রথমটা ডা. বশির মামদানি ও ডা. মিনাল মামদানির লেখা আর দ্বিতীয়টার লেখক হলেন ডা. অনিরুদ্ধ মালপানি।